# সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা
# অসাধারণত্ব ও অসম্পূর্ণতা

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনানন্দ দাশের পর যে কয়েকজন মাত্র কবির স্বপ্ন-ব্যথা, সৃজনের আকাশের কাছে বাঙালির নান্দনিক অন্বেষণ ঋণী ও নতজানু, তাঁদের প্রধান একজন নিঃসংশয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

যদিও জীবনানন্দ দাশ কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তর কবিতার অন্তর্জ্ঞান ও অনুভূতি মূলত নিরাশাখিন্ন, তাতে মর্মের কোনও আস্তিক্য ও উত্তরণের কোনও স্পষ্ট বৃহৎ উপাখ্যান কিছু নেই। অন্যদিকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় তাঁর 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থ থেকেই উন্মোচিত, সংগ্রাম ও উত্তরণের এক সংকল্পিত আলেখ্য। এই ধরণের 'উদ্দেশ্যরূপী' কবিতার অন্বেষণ ও গতিভঙ্গি এমনই, নান্দনিকতা তার কাছে হয়ে ওঠে অনেক সময় এক উপায়, এমনই এক দ্রুত নিষ্পন্ন উপায় ও সৃষ্টিকল্প, যাতে প্রধানত ছায়া পড়ে না কোনও বিষাদ বা অন্ধকারের। কবিতায় অধরা থেকে যায় জীবনের নানা রক্ত-ব্যথা, রহস্যের অনুভূতিমালা। কারণ, কবির তখন অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে কবিতা থেকে বার করে আনা আশ্বাস ও আলোবিস্ময়ের এমন এক মিলিত যুগলবন্দি, যা মানুষকে ক্রমমুক্তির পথ দেখাবে। পাঠক স্মরণ করুন, সুভাষের কবিতায় এই 'ক্রমমুক্তি'র সম্ভাবনা, 'কুয়াশা কঠিন বাসর' এর বাধা অতিক্রমী ওই আলোর পথযাত্রা, একটা সময়ে আমাদের এই কলকাতায় কোনও 'ক্লিশেড' বা প্রশ্নজর্জর শব্দবন্ধ ছিল না। সুতরাং বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে সত্তরের মধ্যপর্ব অবধি সুপ্রচুর বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, রাজনীতি ও আভাঁ-গার্দ সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে সেটি ছিল কমিউনিস্টদের যুগ। স্বাধীনতা আন্দোলন, আই পি টি এ, ক্ষুধা-রক্ত-মৃত্যুর পীত আকাশ পেরিয়ে তারাই হয়ে উঠতে চেয়েছিল পরিত্রাণের বিকল্প দিশা, পাবক ও নক্ষত্রবীথি, সেই অন্ধকারে।

সময়ের সেই অনিশ্চিত ঋতুতেই যেন আচম্বিত উল্কার মতোই সাহিত্যের জগতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। তার অব্যবহিত পূর্বেই আমরা দেখেছি সমর সেনের কবিতায় মধ্যবিত্তের খিন্ন জীবনে অনেক সম্ভাবনা, মিথ ও মহীরুহের অন্তর্ধান। দৈনন্দিন সেখানে মায়াহীন, স্বপ্নহীন, ছিন্ন পত্রদল। 'কঙ্কাল গাছের হাতছানি প্রখর রৌদ্রে...', 'অন্ধকারে অন্ধলোকের চলাচল বধির জনের সঙ্গে কথাবলা' (শবযাত্রা)। এবং আমরা দেখেছি, 'ট্রামলাইন শেষ হলে, শেষ হলে ধূসর শহর...', অন্ধকার মাটি হতে উত্থিত কেতকী ফুলের গন্ধ সমর সেনের কবিতার কোনও রহস্য বা রিলিফ পয়েন্ট হয়ে ওঠে না। তবুও তাঁর কবিতার তীক্ষ্ণ প্রত্যাখ্যানের অন্তরালে থেকে যায় বিষণ্ণতার যেটুকু অন্তর্লীন মাধুর্য, সুভাষের কাব্যভাষা থেকে যেন

সেটুকুও নির্বাসিত হয়। গড়ে ওঠে নাগরিক জীবন থেকে আহৃত নির্মিতির এমনই এক অন্যতর অভিজ্ঞান, যা বাঙালির কাব্যপাঠের ইতিহাসে অনেকটাই ছিল অশ্রুতপূর্ব। সমর সেনের কবিতায় বেদনাহীন শহর, রুক্ষ জনপথ, মেঘলিপ্ত আকাশ, অথচ বৃষ্টি নেই কোনও। সভ্যতা ও ক্ষমতার 'নিয়ামক ডিসকোর্স'-এর প্রাবল্য কবিতাকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে থাকে। কবির কাছেও এই জনতা 'ফিলিস্টিন', অনর্থ জনপিণ্ড, তাই কবিরও এই 'বধিরজনদের' সঙ্গে কথনে ভীতি। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় স্বভাবতই বৃষ্টি ঝড়ে রূপান্তরিত হয়। আধিপত্যের নিয়ামক কথনকে ধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করতেই যেন এক তোলপাড় ঝড় মাথায় করে, এবং বজ্রকে বধির করে, তাঁর এই নতুন কাব্যভাষার আগমন। এবং এই অন্যতর কাব্যভাষার প্রতিস্পর্ধা ও আলোবিস্ময়ের পাশে ওই চল্লিশের দশকেই সোনার বৃষের পেছনে ছুটে চলা ফাল্গুনী কবিদের, সুভাষের ভাষায়, পাঠকের চোখে অনেকটা করুণ ও '...অর্ধেক চাঁদের মতই চ্যাপ্টা' মনে হতে লাগল। বাস্তবিকই সুভাষের কবিতার ওই বিবাদী স্বর, শহুরে, সুখী রোমান্টিকতার স্মৃতি-চিহ্ন মুছে কবিতায় গ্রথিত করতে চাইল — এক না-রোমান্টিকের স্রোতোশ্চলতা, অথবা এক 'বিপ্লবী' রোমান্টিকতার অতিপ্রত্যয়ী অথচ সহজ নান্দনিকের রূপকল্প। দিনানুদৈনিকের কথ্যভাষা থেকে এই রূপকল্প ও কবিতার নির্মাণ, কবিতার সঙ্গে ওতপ্রোত বাঙালি পাঠকের অধিকাংশকে সেদিন প্রকৃতপক্ষে বিস্মিতই করেছিল।

'হাত', 'কাজ' বা 'ভাত'-এর মতো রোজকার অপরিহার্য বিশেষ্য পদগুলি যে কবিতায় সহসা রূপান্তরিত হতে পারে, 'বেকার যুবক', 'কলের শ্রমিক' ও 'বুর্জোয়া শ্রেণির' রূপক বা অভাবনীয় 'সিনেকডকি' তে — কথ্য-ভাষা থেকে 'টক-পোয়েট্রি'র নিভৃত সম্ভাবনাকে নিষ্পন্ন করলেন সুভাষ, বাংলা কবিতায় মিথ হয়ে যাওয়া একটি পঙক্তির মধ্যবর্তিতায় : 'যার হাত আছে তার কাজ নেই, যার কাজ আছে তার ভাত নেই', এবং '...যার ভাত আছে তার কাজ নেই'। ('মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ')

মুখের ভাষা থেকে কবিতা সৃজনে সহজিয়া প্রকরণের অবলম্বন আমরা ইতিপূর্বে পাইনি তা নয়। সাংবাদিকতার সমধর্মী প্রকরণ ও সাধারণের সহজ, খাঁটি বাংলা যে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার অমোঘ স্টাইল, বঙ্কিমচন্দ্রেরও তা নজর কেড়েছিল। যদিচ, উচ্চভাবহীন ও পরিশীলনে দুর্বল সেই উনিশ-শতকীয় নিরীক্ষা সাহিত্যের মান্য ইতিহাসে গুরুত্বহীন থেকে গেছে। একই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক, সুভাষের বছর দশেক আগেই অজিত দত্তের মতো কয়েকজনের সৃজনে কথ্য-বাংলা হতে পয়ারে নিষ্পন্ন কয়েকটি মনে রাখার মতো পঙক্তি।

তাই, সহজিয়া নান্দনিকের পূর্ব-ইতিহাস একটা ছিলই। সুভাষ তাকেই যেন তাঁর সময়ের দীনতা, অসাম্য, অপহ্নবের কালো পাহাড়-অতিক্রমী এক সংগ্রামী ও মতাদর্শ-নির্ভর, ফলত সহজ এক ক্রমমুক্তির সাংস্কৃতিক লজিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিতে চাইলেন।

এখানে স্মর্তব্য, মতাদর্শ-নির্ভর এই কবিতার নিহিত অন্বেষণ ও অনুজ্ঞা অবশ্যই আজও অপ্রাসঙ্গিক নয়। ধ্রুপদি মার্ক্সতত্ত্ব বিতর্ক-অনপেক্ষ না হলেও, আধুনিক সভ্যতার তাবৎ আলোবিস্ময়ের অন্তরালে সবসময়ই জমে আছে একটি মৃত শ্রমের আখ্যান এবং শ্রমের বঞ্চনাকে বাদ দিয়ে পুঁজির নিরন্তর পুনর্গঠন সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা জানি সেটি একটি রেজিস্টারে। অন্যদিকে, এই দৃষ্টিকোণ সামাজিক আধিপত্যের অন্যান্য 'হায়ারারকিকাল' অবদমনের রক্ত-ব্যথা ও তার অন্তর্চিহ্নগুলিকে সহজে আত্মস্থ করতে সক্ষম নয়। পিতৃতন্ত্রের কোনও গ্রাহ্য বিশ্লেষণ মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বে নেই। ফলত, নিম্নবর্গ ও নারীর জীবনের রক্ত-দীর্ণ বাস্তবতা থেকে উত্তরণের ধ্রুবপথ এই দর্শনের গভীরে লভ্য নয়। অনেকান্ত ভাবনার সঙ্গে যোগসূত্র ও মেলবন্ধনে এই নিরীক্ষা স্পষ্টতই সীমাবদ্ধ। তাই সুভাষের কবিতার নিহিত প্রতিস্পর্ধার নিরন্তর উচ্চারণ, ক্রমমুক্তির স্বপ্ন, আজকের সময়ে বাস্তবতা বিয়োজিত মনে হতে পারে। যদিচ, তত্ত্বগত

প্রেক্ষিতে তা অপ্রাসঙ্গিক না হলেও, ওই একই প্রেক্ষিতে তা প্রশ্নজর্জরও।

কোনও সংশয় নেই সুভাষ বাংলা সাহিত্যের মিথ হয়ে যাওয়া এমন কিছু অমোঘ পঙক্তির জনয়িতা, যা আজও নস্টালজিক বামপন্থার নিভৃত উচ্চারণে ইতস্তত ঘুরে ফিরে আসে। ফিরে ফিরে আসে আজকের 'প্যারাডাইস বদলের' নতুন মহানগরের মাল্টিপ্লেক্স ও মলের অতি-আলোর নিক্কণের নিচে নিঃশব্দে চাপা পড়ে যাওয়া, এক অন্যতর সময়ের, স্বপ্ন-ব্যথা-সম্ভাবনার সব আশ্চর্য লাইন :

'কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?
কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা —
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে,
কমরেড আজ নবযুগ আনবে না?'
['পদাতিক', ১৯৪০]

কিন্তু বিগত শতাব্দীর মার্ক্সীয় তত্ত্ব ও তার সম্ভাবনার সেই আকাশ আজ অনেকটাই মেঘলিপ্ত। এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণ আজ যতটা অবাস্তব, সুভাষের কবিতার নিহিত প্রতিস্পর্ধা ও অস্বীকারকে আজ ততটাই অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়া স্বাভাবিক। এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। অনেক সমালোচকের ভ্রূসন্ধিতে বিরক্তির কারণ, সহজিয়া নান্দনিকের ও মুখের ভাষায় নিষ্পন্ন আজকের যে কবিতা 'র‍্যাম্প'-এর পদযাত্রী বা ফেসবুকের উচ্ছ্বসিত 'ইউফোরিয়া'য় বিলীন, তার মূলে নাকি সুভাষের কবিতা। তাঁদের ধারণা কবিতার এই হালকা আঙ্গিকের সার্বত্রিকতা ও রমরমা, তাঁরই কবিতার 'পপ'-এর হাত ধরে। বোঝাই যায় অভিযোগটি দুর্বল, সুতরাং গ্রাহ্য নয়। কারণ সহজের আঙ্গিক, কবিতা সৃজনে তার উৎকর্ষের সম্ভাবনাকে কখনোই নাকচ করে না। এবং দ্বিতীয়ত, 'র‍্যাম্প'এ বিলীন হওয়া আজকের হালকা কবিতার অগভীর দীনতাকে, 'পদাতিক'-এর কবির 'সহজিয়া' আঙ্গিকের সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা বা তাঁর কবিতায় নিহিত মতাদর্শকে আজকের সংকট থেকে বিয়োজিত করে দেখা অনুচিত। কারণ সহজ আঙ্গিকের 'প্রটোকল' শুধুমাত্র 'উদ্দেশ্যরূপী' শিল্প-কবিতার অন্বিষ্ট নয়, তা গণতন্ত্রেরও অভিপ্রেত। গণতন্ত্রের বাজার সবসময়ই চেয়ে এসেছে 'লো-ব্রাউ', অগভীর সাহিত্য। তদুপরি আজকের উত্তরআধুনিক ধনতন্ত্র যখন বামপন্থার তাবৎ 'র‍্যাডিকালিটি'কে আত্মসাৎ করতে সচেষ্ট, তখন একই সঙ্গে 'উচ্চ-আর্ট' ও 'ডিমোটিক'-এর পূর্বেকার বিভাজনরেখার বিলুপ্তির নতুনতর বাস্তবতায় শিল্প-কাব্যের বড় অংশের অন্বেষণ তো ঝুঁকবেই অগভীর নির্মিতি ও প্রকরণের দিকে। এবং বোঝা প্রয়োজন, আজকের 'প্যারাডাইম' বদলের নতুন ধনতন্ত্রে, শিল্প-কবিতার প্রাকরণিক উৎকর্ষ বা গভীরস্পর্শী বোধ তার সার্থকতার কোনও প্রধান মানদণ্ড নয়, বরং 'পণ্য-ডিমোটিক্স'-এর নতুন 'প্রটোকল' যেন রচনার সহজবোধ্যতাকেই করে তুলতে চাইছে কবিতার প্রাথমিক 'এথিক্স'। তাই আজকের হালকা ও গভীরতাহীন কবিতার র‍্যাম্প বা 'সোশ্যাল-মিডিয়ায়' বিলীন হওয়ার সঙ্গে সুভাষের নিরীক্ষাকে যুক্ত করা, অর্থাৎ তার প্রেক্ষিত হিসাবে সুভাষের কবিতায় অনুশীলিত তাঁর 'সহজ' এর নান্দনিকতাকে চিহ্নিত করার দৃষ্টিকোণটি যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

২

বিষণ্ণতা বা নৈরাশ্যের তীব্র দ্যোতনা সুভাষের কবিতার অন্তর্গভীরকে, অল্প মাত্রায় হলেও, স্পর্শ করেনি তা নয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ্য, গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে লিখিত তাঁর 'সালেমনের মা' কবিতাটি।

পাগল বাবরালির চোখের মতো আকাশ।
তার নীচে পাঁচ ইস্টিশান পেরনো মিছিলে
বারবার পিছিয়ে পড়ে'
বাবরালির মেয়ে সালেমান
খুঁজছে তার মাকে।
এ কলকাতা শহরে
অলিগলির গোলকধাঁধায়
কোথায় লুকিয়ে তুমি,
সালেমনের মা?
বাবরালির চোখের মতো এলোমেলো
এ আকাশের নীচে কোথায়
বেঁধেছ ঘর তুমি, কোথায়
সালেমনের মা?...
['সালেমনের মা', কাব্যগ্রন্থ 'ফুল ফুটুক']

এখানে আকাশের অনিশ্চয়তা বোঝাতে, আরও ভয়াবহ, বাবার অসুস্থ চোখের ওই রক্তস্পর্শী 'মেটাফোর'এর আশ্চর্য ব্যবহার, এবং তার ঠিক পরেই — 'পাঁচ ইস্টিশান পেরনো মিছিলে' একটি অসহায় ছোট মেয়ের মাকে হঠাৎ হারিয়ে ফেলার উদ্বেগলীন ভীতি, বাংলা গদ্য কবিতায় সম্ভবত নেই। তদুপরি, এই কবিতায় বর্ণিত শহরের ও মানুষের যেন আশ্রয় গভীর ছায়াতল নেই কোনও। মাথার ওপর সমস্ত আকাশটাই যেন 'পাগল বাবরালির চোখের মতো এলোমেলো'। পাশাপাশি মনে পড়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আর একটি বিখ্যাত কবিতা। যেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকালপ্রয়াণ ও শবানুগমনের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় — এবং ঘটনাকে ঘিরে তাঁর কবিতায় 'মিথ' হয়ে যাওয়া কয়েকটি পঙক্তি :

'ফুলগুলো সরিয়ে নাও
আমার লাগছে।
মালা জমে জমে পাহাড় হয়
ফুল জমতে জমতে পাথর
পাথরটা সরিয়ে নাও
আমার লাগছে।'

অতঃপর অন্তিম স্তবক :

কাঁধ বদল করো
এবার
স্তূপাকার কাঠ আমাকে নিক।
আগুনের একটি রমণীয় ফুলকি
আমাকে ফুলের সমস্ত ব্যথা
ভুলিয়ে দিক।।'
['পাথরের ফুল', কাব্যগ্রন্থ 'যতদূরে যাই' (১৯৬২)]

পনেরো মাত্রার পয়ারে শুরু এই কবিতায় যেন অতর্কিতে কবি ফুলের সব অমলিন ও মান্য অন্তর্চিহ্নগুলিকে ভেঙে দিলেন। আমরা জানতাম ফুলকে দিয়ে সভ্যতা এবং মানুষ অনেক মিথ্যে বলিয়ে নিয়েছে। সুভাষ এই শীতল অভিজ্ঞতাকে সুন্দর উৎকীর্ণ করলেন কবিতার বর্ণমালায়।

কিন্তু এই ধরণের আক্রান্ত উপলব্ধির ক্ষতচিহ্ন, আঁধার ও বিস্ময় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় খুব বেশি লভ্য নয়। শুধুমাত্র সহজ 'প্রচারধর্মী' কবিতাই নয়, পরিণত-সন্ধানী, 'টিলোস'এ বিশ্বাসী শিল্প-কবিতাও সাধারণত কোনও ধ্বস্ত সময়ের অন্তরগভীরে ব্যক্তির নিমগ্ন-ব্যথা, নিরর্থকতা ও ধূসর আর্তনাদগুলির অন্তরচিহ্নকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। ব্যক্তির একাকিত্ব ও পরাজয় হয়ে ওঠে এমনই এক 'বিচ্ছিন্ন' অন্ধকার, কবিতার যেন কোনও নৈতিক দায় থাকে না তার প্রতিলিপিকে উন্মোচন করার। উত্তরণবাদী কবিতার এই সরলরৈখিক প্রবাহমানতা থেকে সুভাষের সৃষ্টিও তাই নিষ্ক্রমণের কোনও সঠিক পথ খুঁজে পায়নি। আবার একটি রেজিস্টারে এই ধরণের বিশ্লেষণ, আজকের ক্রিটিকাল নিরীক্ষার একমাত্র নিষ্প্রশ্ন অবলম্বন হতে পারে না। কেননা স্মর্তব্য, আত্মবাদী, মগ্নচৈতন্যের সৃজন, অথবা কবিতায় 'মেলাঙ্কলিক' গহন, ব্যক্তির হৃত আত্মার অন্বেষণে, সমাজের নিরালোক ও রক্তক্ষরণ আর দেখতে পায় না। ফলে, চক্রাকারে আবর্তিত (রাউণ্ড এণ্ড রাউণ্ড) নিয়ো-লিবারাল ধনতন্ত্র এবং পিতৃতন্ত্রের মতাদর্শের কাছে তা সহজে সমাদৃত ও মান্য হয়ে ওঠে। তাই শৈলীর উৎকর্ষে উত্তীর্ণ এমন 'মেলাঙ্কলিক' কবিতাকে অনেক সময়ই 'ক্যাননিকাল' হয়ে উঠতে দেখা যায়।

তাই, আজকের সময়ের এই 'ধারাবাহিক বর্তমান'-এর (perpetual presence) নির্লিপ্ত ফলকে সুভাষের কবিতার সমস্ত দ্রোহ ও প্রতিস্পর্ধাকে এক পরিসমাপ্ত নিরীক্ষা ও ব্যর্থ নখাঘাত হিসেবে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। পাশাপাশি স্মরণীয়, টেকনিক ও ছন্দের নির্মিতিতে তাঁর অনুশীলিত প্রকরণ বাংলা কবিতার আধুনিকতায় এক অনপনেয় উত্তরাধিকার। বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছিলেন, 'তিনমাত্রায় যুগ্মস্বরের ব্যবহারে এবং প্রান্তিক যুগ্মবর্ণের প্রয়োগে...' তাঁর কবিতা মিল বর্জিত হলেও পাঠক কখনই তা বুঝতে পারবে না।

'ঘড়ির কাঁটায় কত যে মিনিট মরছে,
মনে অনন্ত সময়ের অধিরাজ্য;
ভুলেছি, জ্যোৎস্না হারিয়ে হরিৎ ধান্য
এখানে বন্দী আনা তিনেকের বাল্বে'

[দ্বিতীয় স্তবক : 'রোমান্টিক', 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থ (১৯৪০)]

'রাত্রি কিন্তু রাত্রিরই পুনরুক্তি
চাঁদের পাড়ায় মেঘের দুরভিসন্ধি;
হৃদয়-জোয়ারে ভেঙে যায় সংকল্প
ম্লান হয়ে যায় সবহারাদের বস্তি।'

[উপরোক্ত কবিতা, শেষ স্তবক 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থ (১৯৪০)]

তন্নিষ্ঠ পাঠক জানেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ওই পদাতিক কাব্যগ্রন্থের 'গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এল' (বধূ) কবিতাটির প্রাথমিক পঠনে একটি উত্তীর্ণ বা ভাল কবিতার বেশি কিছু বলে মনে নাও হতে পারে। তবে একাধিক পঠনে কবিতাটির আরও কয়েকটি ভাব ও মাত্রা আমাদের বিস্ময়সম্পৃক্ত করে। এবং ঠিক তাই। 'ঠাট্টা' ও 'দীর্ঘশ্বাসের' নিহিত মেলবন্ধন অনাবৃত করে বুদ্ধদেব বসু এই কবিতাটিকেই তাই মনে করেন 'মাস্টারপিস', অন্তত 'tour de force' তো অবশ্যই।

'ছাদের পারে হেথাও চাঁদ ওঠে —
দ্বারের ফাঁকে দেখতে পাই যেন
আসছে লাঠি উঁচিয়ে পেশোয়ারি
ব্যাকুল খিল সজোরে দিই মেলে।
ইহার মাঝে কখন প্রিয়তম
উধাও; লোকলোচন উঁকি মারে
লেকের কোলে মরণ যেন ভালো।'

এবং শেষ স্তবক :

'বুঝেছি কাঁদা হেথায় বৃথা; তাই
কাছেই পথে জলের কলে, সখা
কলসি কাঁধে চলেছি মৃদু চালে
গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এল।'

[বধূ : 'পদাতিক' ১৯৪০]

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে মতদ্বৈধ থাকে না যখন তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের 'বধূ'র এ এক 'বিশ-শতকীয়' সম্প্রসারণ।

তাই রবীন্দ্রনাথের পর, আমাদের বাংলা কবিতার আধুনিকতার সর্বোচ্চ নক্ষত্রশিখর যদি হয়ে থাকেন জীবনানন্দ দাশ — তাঁর কবিতায়ই যদি উৎকীর্ণ হয়ে থাকে জীবনের আত্যন্তিক আলোবিস্ময় — অন্যদিকে, অনেক নিমগ্নব্যথা ও নিরালোকিত সময়ের সবচেয়ে গভীরতম ভাষ্যরূপ — সেক্ষেত্রে অনেক অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দের পাশে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সবসময়ই আধুনিক কবিদের অগ্রগণ্য একজন হিসেবেই বিবেচিত হবেন।

আমার ধারণা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার এই সমুদয় 'অসম্পূর্ণতা'ই কবিতার আধুনিকতার অনুষঙ্গে, 'অবিনির্মাণ'-এর (deconstruction) ভাষায় এক 'নেসেসারি এরার' বা 'প্রয়োজনীয় ভ্রান্তি'। এখানে তাঁর অসম্পূর্ণতা বা 'এরার' সেইখানে, যেখানে তাঁর কবিতার সমর্পিত নিরীক্ষা, আলো ও অন্তর্ঘাত, 'আধুনিকতা'র মান্য নিরিখগুলিকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়নি। অন্যদিকে, তা 'নেসেসারি' বা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে কারণ, — সুভাষ ও তাঁর পাশাপাশি আরও কয়েকজন কবির আধুনিকতার বহুস্বর (polyphoney), ওই একজন কবির একটি 'অলোকসামান্য' সৃজনের ধারাকে ঘিরে গড়ে ওঠা 'আধিপত্য'র নিগড়টিকে হয়ত কিছুটা প্রশ্নজর্জর করে তুলতে পারবে। দেখাতে পারবে নির্মিতির ওই ভাব ও ভাষাশরীরের অন্তর্নিহিত কিছু গ্রাহ্য অনুভূতির শূন্যতা, 'অ্যাবসেন্স' বা অনুপস্থিতিগুলিকে। অর্থাৎ, একজন কি দুজন কবির শিখরস্পর্শী 'হেজিমনি'র প্রেজেন্সকে নিষ্প্রশ্ন মেনে না নিয়ে, তাকে একটি 'অবিনির্মাণী' পঠনের মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারবে। হয়ত তাতে 'আধুনিকতাবাদী' কবিতার প্রাধান্যকারী ও মান্য 'ক্যাননগুলি' সম্পূর্ণ 'চ্যালেঞ্জড্' হয়ে যাবে না, কিন্তু তার কবিতার 'নান্দনিক' ও দার্শনিক পরিসরগুলির অন্তর্জগৎকে কিছুটা 'unstable' বা অস্থির করে তুলতে সক্ষম হবে। এবং আমরাও হয়ত ক্ষণিক আত্মজিজ্ঞাসায় প্রণোদিত হয়ে ভাবতে পারব — আধুনিক কবিতার একটি 'প্রাধান্যকারী', 'উচ্চরূপ' মডেল নির্মাণের পথে কী কী পার্শ্বরেখায়িত হয় অথবা বাদ যায় এবং কেন যায়? পাশাপাশি, ষাট সত্তর বছর আগে নিরূপিত, বাংলা আধুনিক কবিতার 'ডেপথ হারমোনিউটিক্স' বা গভীরস্পর্শতা নির্ধারণের পূর্ববর্তী মডেলগুলি আজকের 'প্যারাডাইস' বদলের নতুন প্রেক্ষাপটে কতটা ফলপ্রসূ?

**শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়** : কবি ও প্রাবন্ধিক।